Rs. 2.00 | PRABINBARTA | MONTHLY
মূল্য ঃ ২ টাকা | প্রবীণবার্তা | মাসিক

Vol : XIV Issue : XII, 15th March, 2025. ১লা চৈত্র, ১৪৩১, বার্ষিক মূল্য- ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

এই মার্চ মাসটা আমাদের সংগঠন ও পত্রিকার বছরের শেষ মাস। আমরা আর একটু পরিণত হলাম অথবা চরমের (মৃত্যু) দিকে আর এক পা এগোলাম। স্বভাবতই মূল্যায়ণের মাস। সেটাই আগে করা যাক। গত বছরটা আমরা ভালো-মন্দের আলা-আধাঁরিতে কাটিয়েছি। ঐতিহ্য মেনে পূরাতন সব প্রথা/অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে পালন করেছি। পত্রিকার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল, বিষয়-বৈচিত্র্যের বিস্তার ঘটানো গেছে, লেখার মানের উন্নতির পরিমাপ করা কষ্টকর হলেও অবনতি হয়নি, সর্বোপরি কিছু নতুন লেখক সংযোজিত হয়েছেন। কিন্তু সাংগঠনিক ভাবে আমরা এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের পত্রিকা রেজিস্ট্রেশন আমরা পুনর্নবীকরণ করতে পারছি না। এই পদ্ধতি পুরোপুরিই অন-লাইন নির্ভর, ফলে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগও করা যাচ্ছে না। আমাদের চিঠিরও কোনো উত্তর পাইনি। ফলে পত্রিকা স্বল্পমূল্যে ডাকযোগে প্রেরণের সুবিধা আমরা এই মুহূর্তে পাচ্ছি না। এলাকা ভিত্তিক পত্রিকা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলের সহযোগিতা কাম্য। পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে যে কোনো সহায়তা/উপদেশ সতত কাম্য।

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস সাড়ম্বরে পালিত হলেও পুরুষতন্ত্র এবং সামাজিক বৈষম্যের চাপে নারীদের অবস্থান অথৈবচ। আর জি কর-এর অভয়া আজও বিচার পায়নি। উপরন্তু, কিছুদিন ধরেই আত্মহত্যার (একক ও প্রায়শই যৌথ) খবর আমাদের পীড়িত করছে। প্রথমে হত্যা সন্তান বা প্রিয়জনকে চরম অপমান থেকে নিজেকে বাঁচাতে বা পারিবারিক সম্মান রক্ষায়, তারপর আত্মহত্যা। সম্মান রক্ষার্থে হত্যা বা 'অনার ফিলিং' শুধু পরিবার অননুমোদিত প্রেম, বিয়ে বা সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ঘটে না, অপরিশোধ্য ঋণ বা আর্থিক দুর্গতি কেন্দ্র করেও হতে পারে। অনার ফিলিং-এ ঘাতক নারীটির (সাধারণত অল্পবয়সি) পরিবারেরই পুরুষ সদস্য এবং পরিবারের সম্মতিক্রমেই হত্যাকান্ড ঘটায়। এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা মায়ের মন্দিরে বলিপ্রদত্ত পাঁঠাটির সমতূল্য। সাম্প্রতিক সাড়া জাগানো ট্যাংরা কান্ডে আমরা দেখি মৃত্যু হয়ছে পরিবারের তিন সদস্যার, দুই বউ ও এক কণ্যার। বেঁচে আছেন এক পুত্র সন্তানসহ দুই কর্তা। অনার ফিলিং কোনো স্বতঃস্ফূর্ত তাৎক্ষণিক আবেগের বশে ঘটে না। এটা পূর্বপরিকল্পিত, পরিবার- অনুমোদিত সিদ্ধান্ত।

অনেকে বলছেন, আত্মহত্যা বা নানা অপরাধ প্রবণতার কারণ সামাজিক অবক্ষয় বা সামাজিক পুঁজির অনটন। সামাজিক পুঁজি বলতে বোঝায় মানুষের পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা। প্রতিবেশীরা দূরে সরে যাচ্ছে এবং মানুষ সামাজিক সংগঠনগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আসলে যেখানে আর্থিক বৈষম্য বেশী সেখানে সামাজিক পুঁজি কম। আবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রধান অস্ত্র, গুলি-বন্দুক বা পুলিশ নয়, শিক্ষা। যে দেশে আয়ের বৈষম্য যত বেশি। তাদের শিক্ষার খরচ তত কম। উদাহরণ ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ফলে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা দুটোই ক্রমবর্দ্ধমান।

আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে সামাজিক মূলধন বাড়াবার চেষ্টা করব। কবির ভাষায়, 'আয় আরো বেঁধে, বেঁধে থাকি।'

শিরদাঁড়ার সঙ্কট

মৃগেন গাঁতাইত

শিরদাঁড়াগুলো কেমন সব ঝুঁকে পড়ছে। কেন ঝুঁকছে? গন্ডগোলটা কোথায়? শিরে, না দাঁড়ায়? উত্তর হল, রোগটা প্রথমে শিরে হয়, তার ফলে দাঁড়া ঝুঁকে যায়।

শিরে রোগটা কী হয়? মনের মধ্যে জমে ওঠা লোভই মাথাকে নুইয়ে দেয়। আমার নিজের শ্রমের মূল্য আমি সোজাসুজি দাঁড়িয়েই নিতে পারব, তা যত সামান্যই হোক। অপরের ছিটেফোঁটা ছুঁড়ে দেওয়া জিনিস মাটি থেকে কুড়াতে গেলেই মাথা নীচু করতে হয়। অপরের ছুঁড়ে দেওয়া জিনিস নেবার ইচ্ছেটাই হল লোভ। এই অনুগ্রহ না নিলেও চলত, তবুও তা পাবার এই ইচ্ছা, আকাঙ্খা বা লোভকে জয় করতে না পারলে শিরদাঁড়া ঝুঁকে পড়বে। মাথা নুইতে নুইতে বেঁকেই যায়। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রচুর অর্থ সম্পদ লাগে না। তাই বলা হয়, এই পৃথিবীতে যা সম্পদ আছে তা সব মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সামান্য লোকেরও সমস্ত লোভ মেটানোর জন্য বাড়ন্ত। লোভের জন্যই মানুষ নীতি বিসর্জন দিয়ে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়।

যেমন, একজন ডাক্তার হাসপাতাল মালিকের হয়ে টাকা চুরিতে সাহায্য করে; শিক্ষক নিয়ম বহির্ভূত প্রাইভেট টুইশন করে; ইঞ্জিনীয়ার, কন্ট্রাক্টর ব্রিজ নির্মাণে সিমেন্ট চুরি করে; কারখানার মালিক শ্রমিকদের পাওনা টাকা আত্মসাৎ করে; প্রশাসনের আধিকারিকরা দুর্নীতিবাজদের মদত দেয়; ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লোপাট হয়ে যায়; শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরা অবাধে মানুষের সম্পদ লুট করে, আর একদল রাজনৈতিক লোকেরা ওইসব অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। আর, খুব সাধারণ মানুষ জমি বা টাকার লোভে ভাইকে খুন করে, যৌনসুখের লোভে অন্যকে ধর্ষণ খুন করে। এরকম আরো অনেক ক্ষেত্র আছে।

লোভকে কি জয় করা সম্ভব? চেষ্টা তো করা উচিত। লোভে অনেক অর্থসম্পদ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অত সম্পদ কী ব্যক্তি মানুষের কাজে লাগে? এক লক্ষ কোটি টাকার মালিক হলেও একসঙ্গে পাঁচ কেজি সন্দেশ খেতে পারব না, কুড়ি বোতল মদ খেতে পারব না। একসঙ্গে তিনটে গাড়ি চড়তে পারব না। তাহলে প্রচুর টাকার কী দরকার? টলস্টয়ের সেই বিখ্যাত গল্পের মতন শেষ পর্যন্ত তো চাই সাড়ে তিন হাত জায়গা। তার আগে লোকটা লোভে লোভে অনেক জমির জন্য ছুটতেই থাকল, কিন্তু দিনের শেষে ওই সাড়ে তিন হাত ছাড়া কোন জমিই তার লাগল না।

প্রচুর অর্থ থাকলে নিজেকে প্রতাপশালী, প্রভাবশালী, খ্যাতিমান মনে হয়। তাইতো অর্থলাভের জন্য এত আকাঙ্খা, লোভ। কিন্তু প্রতাপশালী হবার এই অনুভূতি নেহাতই আপেক্ষিক। যারা আমাকে চেনে না, তারা আমাকে দেখে প্রতিপত্তিশালী ভাববে না। তাদের অনুভূতিতে আমার অর্থ, প্রভাবের কোন মূল্য নেই। রাশিয়ার সব চাইতে নামী ফিল্মস্টারকে আমি চিনি না। সে কলকাতায় আমার পাড়ায় এসে ঘুরে বেড়ালেও ঐ ফিল্মস্টারের গ্ল্যামারের প্রকাশ শূণ্য থাকবে, লোকেরা তাকে ঘিরে ধরবে না। একই ঘটনা ঘটবে জার্মানির কোনো শহরে উত্তমকুমার ঘুরে বেড়ালে।

এই গ্ল্যামার প্রতিপত্তি যদি নেহাতই আপেক্ষিক হয়, অর্থাৎ শুধু কিছু মানুষের সান্নিধ্যেই তার প্রকাশ মাত্র, তাহলে এমন কিছু কি আছে যার প্রকাশ নিজস্ব দ্যুতির অভিব্যক্তি? চাঁদ যতই উজ্জ্বল দেখাক, তা সূর্যের আলোর প্রভাব মাত্র, তাই তা ক্ষীয়মান হয়ে যায়। কিন্তু মিটমিটে নক্ষত্র বরাবরের জন্য জ্বলজ্বলে থাকে।

আমরা কি চাঁদ হতে চাই, না নক্ষত্র হতে চাই? চাঁদের উজ্জ্বলতার জন্য অন্যের আলো চাই, নক্ষত্রের তা প্রয়োজন নেই। অর্থসম্পদের আলোয় যে ঔজ্জ্বল্যের গর্ব, সেই অর্থসম্পদ অর্জনের জন্য চাই যেনতেন

প্রকারেন অর্থসংগ্রহ করার লোভ আর নীতিহীনতা। অতি বড় ধনশালীরও মাথা নোয়ানো থাকে বিশেষ কোথাও। অনৈতিক অর্থসম্পদ ছাড়াই নিজে দীপ্যমান থাকা যায় মনের উজ্জ্বলতায়, যা কখনোই ক্ষীয়মান হয় না। প্রদীপের আলোর মতনই তাকে আস্তে আস্তে ধৈর্য ধরে জ্বালাতে হয়।

অন্তরের আলোর সলতেটা আমাদের নিজেদেরকেই পাকাতে হবে, তাহলে শিরদাঁড়াটা সোজা থাকবে।

মহান মানবতাবাদী ডা. নর্মান বেথুন স্মরণে

অশোক রঞ্জন ধর

"প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রুগি আসে ডাক্তারের কাছে, ডাক্তার রুগির কাছে যায় না। এই নিয়মটা পাল্টে দিতে হবে। আমরা যারা ডাক্তার, তাদের গিয়ে হাজির হতে হবে রুগির দরজায়, ঘুরতে হবে মানুষের মধ্যে রোগের সন্ধানে দরজায় দরজায়। প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ম করে বন্ধ করে দিতে হবে। সমস্ত চিকিৎসা– পদ্ধতিটার যদি আমূল পরিবর্তন না করা যায় তাহলে কিছুতেই কিছু হবে না।"–

–ডা. নর্মান বেথুন

১৯৩৫ সালের মার্চে ডা. নর্মান বেথুন এই কথাগুলি বলেন। তখন যক্ষারোগ ভয়ানকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মানুষ এই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও মূলতঃ সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে হাসপাতালে তারা যায় না। আক্রান্ত রোগীদের এই উদাসীনতা তাঁর ডাক্তার সত্তাকে অস্থির করে তোলে।

কানাডার উত্তর অনটেরিওর গ্রাভেনহার্স্টে ১৮৯০ সালে ৪ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন হেনরি নর্মান বেথুন। পিতা- রেভারেন্ড ম্যালকম বেথুন, মাতা- এলিজাবেথ অ্যাস গুডউইন। পিতামহ ছিলেন বেথুন পরিবারের এক উজ্জ্বল রত্ন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক। ক্রমে নর্মান বড় হতে থাকেন। কলেজে পড়ার সময় তাঁকে রোজগার করতে হোত। বিশ্বযুদ্ধের দাদামা বেজে ওঠে। মেডিকেল কলেজে এম. ডি. পরীক্ষার ১ বৎসর আগে কানাডা হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করে। তিনি সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে কানাডিয়ান ডিভিশন ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সে স্ট্রেচার-বাহকের কাজ নিয়ে ফ্রান্সে চলে যান। তখন তাঁর বয়স ২৪ বৎসর। যুদ্ধে আহত হয়ে মাস ছয়েক বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসান্তে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হয়ে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে যান।

ইতিমধ্যে নর্মান ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে স্যানিটোরিয়াসে ভর্তি হন। সেখানে নব আবিস্কৃত নিউমোথোরাক্স চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে ফুসফুসের (বামদিকে) অপারেশন করে সুস্থ হয়ে যান।

১৯২৯ সালে তৎকালীন বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ডাঃ আর্চিবল্ডের সহকারী হিসাবে রয়েল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে যোগ দেন। শল্য-চিকিৎসার অনেক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৯৩৪ সালে মন্ট্রিল শহরের অদূরে অবস্থিত সাক্রে ক্যর হাসপাতালে থেরামিক সার্জেন ব্রংকোসকিপষ্ট হিসাবে যোগ দেন। এই সময় একদিন শহরের রাস্তায় খাদ্য ও কাজের দাবীতে মিছিলের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের দৃশ্য নমার্নকে বিচলিত করে তোলে, তিনি মন্ট্রিল বেকার সমিতির নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। এরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে– পার্টির নাম– C.C.F (The Cooperation Commonwealth Federation - The Canadian Social Democrate Party)। ডা. নর্মানকে এরা বলেন কমরেড নর্মান।

১৯৩৫ সালে ডা. নর্মান সোভিয়েট রাশিয়ার লেনিনগ্রাদে International Physiological Congress-এ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন এবং রাশিয়াতে অবস্থান কালে দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/

স্যানিটোরিয়াম ঘুরে ঘুরে যক্ষ্মারোগ ও চিকিৎসা বিষয়ে প্রত্যক্ষ ধারনা নেন। দেখেন ওখানে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিনা অর্থে চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য যক্ষ্মা রোগের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে গেছে।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে প্রায় একশত ডাক্তার, নার্স ও সমাজসেবীদের নিয়ে ডাঃ নর্মান তৈরি করেন Montreal Group for the Security of the People's Health। উদ্দেশ্য সাধারণের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং এর জন্য প্রয়োজন–

১। জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের।

২। সরকারকে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

৩। সকলের জন্য সমান চিকিৎসার সুযোগ।

৪। স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন ইত্যাদির খরচ সরকারকে বহন করতে হবে।

৫। স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে স্ব-শাসিত গণতান্ত্রিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এছাড়া স্যানাটোরিয়াম থেকে বেড়িয়ে আসা যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি আদর্শ রিহ্যাবিলিটেশান সেন্টারের পরিকল্পনাও তিনি করেন। কিন্তু অধিকাংশ ডাক্তার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জন-স্বাস্থ্য উন্নতির কথা চিন্তা না করে এর বিরোধিতা করেন। পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

জার্মানি ও ইটালির সহযোগিতায় ফ্যাসিস্টরা স্পেন রিপাবিলককে ধ্বংস করতে বেপরোয়া। মানুষ দলে দলে শহর ছাড়ছে আর যুদ্ধে অসংখ্য লয়ালিষ্ট সৈন্য হতাহত হচ্ছে। Committe to Aid Spanish Democracy-এর প্রস্তাবে ডা. বেথুনের নেতৃত্বে ১৯৩৬ সালের ৩ নভেম্বর Canadian Medical Team মাদ্রিদ পৌছায়। বিভিন্ন রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যালোচনা করে তিনি প্রস্তাব দেন একটি ভ্রাম্যমান রক্তদান কেন্দ্র গড়ে তোলার এবং এর কাজ হবে–

১) স্বেচ্ছাসেবীদের থেকে রক্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

২) আহতদের চিকিৎসাকেন্দ্র ও যুদ্ধ এলাকার হাসপাতালে তা পৌছে দেওয়া।

৩) সর্বোপরি রণাঙ্গণে যুদ্ধের মধ্যেই রক্ত প্রয়োগের (Blood Transfersion) ব্যবস্থা করা।

এই প্রস্তাবে International Brigade-এর প্রধান মেডিকেল অফিসার আর উইন কিস্ক বলেন,

'যদি আপনি এটা করতে পারেন তাহলে চিকিৎসা জগতে আপনি একটা ইতিহাস তৈরি করবেন।'

ডা. বেথুন সহকারীদের নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই কাজে সাফল্য লাভ করেন।

মাদ্রিক ছেড়ে সমগ্র স্পেনে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ায় অস্ত্র সংগ্রহার্থে তিনি কানাডায় ফিরে যান। ১৯৩৭ সালের ১৮ জুন তিনি মন্ট্রিল পৌছান এবং আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন প্রান্তে চেষ্টা চালাতে থাকেন। সাত মাস আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিয়ে আশাতিরিক্ত নৈতিক সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য পাচ্ছিলেন। এই সময় তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জাপানিরা প্রকাশ্যভাবে পিকিং (চীন) আক্রমণ করে। এই সময় একদল আমেরিকান ডাক্তার স্পেনে যায়। ডা. বেথুন মনে করেন বর্তমান সময়ে স্পেনের চেয়ে চীনে ডাক্তারের প্রয়োজন বেশি। নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত China Aid Council ও সাদাম সান-ইয়াং-সেম-এর নেতৃত্বে পরিচালিত China Defence League-এর সাথে যোগাযোগ করে ১৯৩৮ সালের ২ জানুয়ারি চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে ২২ মার্চ সিয়ান ছেড়ে পৌছান– ইয়েসাশান, যেখানে মার্কসবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এখানে বিখ্যাত 'লংমার্চের' (৬০০০ মাইল/মতান্তরে ৮০০০ মাইল) নায়ক মাও-সে-তুঙের সাথে এক বৈঠকে স্পেনের অভিজ্ঞতা এবং এখানে তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন–

১। ঘাঁটি অঞ্চলের শুশ্রুষা কেন্দ্র পরিদর্শন/চিকিৎসা।

২। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চিকিৎসা, রক্ত-সঞ্চালন ও মোবাইল মেডিকেল ইউনিট স্থাপন।

৩। সর্বোপরি উপযুক্ত স্থানে একটি আদর্শ হাসপাতাল স্থাপন।

মাও-সে-তুঙ-এর অনুমোদনক্রমে তিনি লক্ষ্যপূরনে অগ্রসর হতে থাকেন। তিন সপ্তাহ পরে ইয়েশান থেকে ২০০ মাইল দুরে চীন চা-চী'র (বিশেষ সীমান্ত অঞ্চলের ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরিচালনাধীন) জন্য ২৪ এপ্রিল যাত্রা করে জুন মাসে পৌছান। পথিমধ্যে বিভিন্ন Camp-এ আহতদের চিকিৎসা করেন।

শেন-ইন কো গ্রামে বুদ্ধ মন্দিরে অবস্থিত ঘাঁটি হাসপাতাল স্থাপনের এটি আদর্শ স্থান। সহকারীদের ও গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও অদম্য প্রচেষ্টায় পাঁচ মাসের মধ্যে হাসপাতালটি গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়ে।

অক্টোবেরর শেষ সপ্তাহে মোবাইল মেডিকেল টিম সহ স্কহি কিসিং পিক-এর খো তিয়েন লিং-এর নিকট এক গ্রামে যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা শুরু করেন তিনি। ক্রমে চিকিৎসার সরঞ্জাম ও একান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাব দেখা দিচ্ছে। রবারের দস্তানার অভাবে খালি হাতেই অপারেশনের সময় হঠাৎ আঙুল কেটে যায়। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঘাঁটি হাসপাতালগুলি (সংখ্যায় ২০) পরিদর্শন শেষ করে নভেম্বরে আমেরিকা ও কানাডা যাবেন চীনকে সাহায্যের আবেদন নিয়ে। কিন্তু তা আর হোল না। তিনি সেপটিসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন।

ইয়েলো স্টৌন গ্রামে ১৯৩৯ সালের ১৩ নভেম্বর ৪৯ বৎসর বয়সে ডাঃ নর্মান বেথুন সকাল পাঁচটা কুড়ি মিনিটে অমৃতলোকে চলে গেলেন।

পূর্ব শানিসর একটি উপত্যকায় তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। মাও-সে-তুং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'শুধুমাত্র একজন মানুষের মৃত্যু উপলক্ষ্যে যে আমরা শোক করছি তা নয়, করছি তার চেয়েও বড় কোন কারণে। ডা. বেথুনের ভালবাসা ও নিষ্ঠা সকলের কাছে একটা শিক্ষার বিষয়।'

ভারতীয় মেডিকেল মিশনের সদস্য ডা. কোটনিস চীন চপ-চী পৌছানোর পরে তিনি ডিরেক্টর হিসাবে ঐ হাসপাতালের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হাসপাতালের নাম হয় বেথুন স্মৃতি শান্তি হাসপাতাল। ডা. কোটনিস মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ওখানেই ১৯৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর দেহত্যাগ করেন। হাসপাতাল প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেথুন ও কোটনিস স্মৃতি প্রদর্শনীশালা।

পিকিং এর দক্ষিণ-পূর্বে শি চা-চুয়াং নামে একটি শহরে ডা. নর্মানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি শহীদ স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্ত থেকে মানুষ এখানে আসে মহান মানবতাবাদী ডাঃ নর্মান বেথুনকে শ্রদ্ধা জানাতে– তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করতে।

'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।
ডাক্তার বেথুনকে স্মরণ করো।'

তথ্য সূত্রের জন্য ঋণী–

১। The Scalpel, the Swore by Sydney Gondon and Ted Allan.
২। মহাচীনের পথিক– কল্যাণ চোধুরী।
৩। বেথুন আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতাল।

ড. মৃগেন গাঁতাইত। (প্রবীণবর্তা- মার্চ, ২০১৯)

বার্তা

মৃণাল দত্ত

কবি তো মানুষের কথা বলে
দেশপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা জাগায়
তবে তোমাদের কলমে অক্ষর নেই কেন?
রক্তমাখা ভস্মাচ্ছাদির বেদনাবিদ্ধ
কবি, আজ কলমে শোণিতের রঙ
রক্তিম অক্ষরে মানবিক বার্তা দাও
জননীর জন্য রক্তাক্ত ভগিনীর জন্য
ভস্মমাখা শরীরে নটরাজের ডম্বরু বাজাও
জাগো জেগে ওঠো
জাগরণের মন্ত্র আঁকো।

গুরুদেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছিল একালের শিষ্য একলব্য

হরিশঙ্কর পরসাঈ

বিখ্যাত হিন্দি গল্পের অনুসরণে লেখা, জি এম আবুবকরের কলমে রূপান্তর

(হরিশঙ্কর পরসাঈ আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের জনপ্রিয় গল্প লেখক। বর্তমান সমাজের বিষম পরিস্থিতি, অন্তর্বিরোধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় নিয়ে তাঁর লেখায় তীব্র ব্যাঙ্গের কশাঘাত দেখা যায়)

বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক দ্রোণাচার্যজী। পদক্রম অনুসারে বর্তমানে তিনি রীডার। যদিও ক্লাসে ভালো পড়ানোর বিশেষ সুনাম ছিল না, তবে পাঠ্যপুস্তক আর নোটস দিয়ে তিনি ক্লাসের কাজ মোটামুটি চালিয়ে নিতেন।

অধ্যাপক দ্রোণাচার্যের দুই ছাত্র- অর্জুনদাস আর একলব্য দাস। অর্জুনদাস ধণী পিতার সন্তান। সমাজে তাঁর বিশেষ প্রভাব আছে। সরকারি মহলে তিনি যথেষ্ট সম্মান পান। প্রায় প্রতিদিন অর্জুনদাসের গৃহে পদার্পণ করেন অধ্যাপক।

এদিকে অর্জুনদাসও অধ্যাপকের গৃহে হাজিরা দেয়। অধ্যাপকও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক এতই দৃঢ় যে কেউ যদি চোখ বন্ধ করে অধ্যাপককে কল্পনার চোখে দেখে তবে দেখতে পেতো যে তাঁর পেছনে একটা লেজ গজাচ্ছে, আর সেটা অর্জুন দাসের মতোই দেখাচ্ছে।

একলব্য দাস দরিদ্র পিতার সন্তান। অধ্যাপকের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাত কমই হয়। তবে গুরুদেবের প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা আর ভক্তি। সে নিজের ঘরে অধ্যাপক দ্রোণাচার্যের ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। আর গুরুদেবের দেওয়া নোটস্ শিয়রে রেখে শয়ন করে।

দুজন ছাত্রই এম এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। অর্জুন ভাবে, বিদ্যার্জন করে বিশেষ লাভ নেই। বরং তা একমাত্র সম্ভব গুরুদেব যদি কৃপা করেন। অতএব, সে নিরন্তর গুরুর সেবাকার্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে থাকে। অধ্যাপকের বাড়িতে বাজার করা, মুদিদোকানের মালপত্র পৌঁছে দেওয়া, কাপড় সব্জি এনে দেওয়া ইত্যাদি। উৎসব অনুষ্ঠানের দিনে অধ্যাপকের পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চাকে মার্কেটে নিয়ে গিয়ে খেলনা, মিঠাই, এমনকি ড্রেসপত্তর কিনে দিতে পিছ-পা হতো না। আর অন্যান্য অধ্যাপকদের মিসেসদের কেচ্ছাকাহিনী শুনিয়ে তাঁকে খুশি করত।

অধ্যাপকের শরীরের প্রতিও তার খেয়াল থাকে। রাত্রের বৈঠকে অন্যান্য অধ্যাপকদের নিন্দেমন্দ আর মিথ্যে খবর ছড়িয়ে আসর মাত করে রাখত।

অন্যদিকে, একলব্য অধ্যাপকের সেবায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে দিনরাত শুধু পড়া আর পড়ায় মগ্ন হয়ে থাকে।

একদিন অধ্যাপকের সঙ্গে অর্জুনের কথা হয়—স্যার, আপনার বাড়ি আমি মুদিদোকান থেকে আনাজপাতি, কাপড়চোপড়, সব্জি- এই সমস্ত এনে দিই।

হ্যা কিনা? হ্যা বাপু, এনে দাও তো!— আপনাকে সিনেমা-থিয়েটার কে দেখায়? বাচ্চাদের মিঠাই খেলনা ড্রেসপত্তর কে কিনে দেয়?- তুমি দাও, বাবা! তুমিই এসব কাজ করো।— আর কোন ছাত্র আছে আপনার যে আমার চাইতে বেশি প্রশংসা করে আপনার মনোরঞ্জন করে?—নাহ্, কেউ না!— আপনার কেরিয়ার তৈরির পেছনে আমার পিতৃদেবের অনেক অবদান আছে! সত্যি কি না?— অবশ্যই সত্যি।— ভবিষ্যতে ডিপার্টমেন্টাল হেড হবার জন্য আপনি কাকে ধরবেন বলে স্থির করেছেন?— নিঃসন্দেহে তোমার পিতৃদেবকে।— একলব্য কি আপনার সেবাযত্ন করে?— না না, তার গুরুর প্রতি কোনো ভক্তিভাব দেখিনা। সে সব সময় নির্জীব বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে।

আচ্ছা স্যার, একবার বলুন- আপনার সবচেয়ে প্রিয়

ছাত্র কে?– আরে বাবা তুমি! তোমার মতো প্রিয় ছাত্র কেউ হয়নি, আর হবেও না।

হঠাৎ অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলে– তাহলে স্যার, আমাকে বরদান করুন, আমি যেন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে পারি। আর স্টুডেন্ট স্কলারশিপ নিয়ে ফরেনে যেতে পারি! এবার অধ্যাপক চিন্তায় পড়লেন। অনেকক্ষণ চিন্তার গভীরে ডুবে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন– সেটা আমিও চাই, কিন্তু সেপথে বাধা ওই একলব্য। সে ভীষণ মেধাবী আর পরিশ্রমী। অর্জুনদাস বললো- সেসব আমি জানি না। আমি একটাই জানি- আমি যদি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট না হতে পারি তবে গুরুদেবের মহিমা ভঙ্গ হবে। ভবিষ্যতে কোনো ছাত্র আর গুরুদেবের সেবা করবে না। আর এই নিকৃষ্ট পরম্পরা গড়ে তোলার জন্য আপনারই গায়ে কলঙ্কের ছাপ পড়বে! অধ্যাপক আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠলো। অর্জুন অধ্যাপকের তেজোদ্দীপ্ত মুখ দেখে অভিভূত হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো, অধ্যাপকের মুখে সারা জীবন ধরে অর্জিত পুণ্যের আভা ফুটে উঠেছে। অধ্যাপক দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন- তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

পরদিন অধ্যাপক একলব্যকে ডেকে পাঠালেন। এই যে তুমি নিজের ঘরে আমার ছবি টাঙিয়ে রেখেছো কেন? কারণ আপনি আমার গুরুদেব! আমার নোটস্ তোমার শিয়রে রেখে শোও কেন?– দিনের বেলা আমি যা পড়াশোনা করি, রাত্রে সেগুলোই পরীক্ষার জন্য তৈরি করে রাখি। এবার অধ্যাপক তার দিকে গভীরভাবে তাকালেন। তারপর বললেন– তুমি আমার ছাত্র, আমারই শিষ্যত্ব মেনে চলছো তুমি। অতএব, আমায় তোমাকে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে! একলব্য জবাব দিল-আমি আপনাকে কী বা দিতে পারি, স্যার! আমার বাবা কোনো অসততার আশ্রয় নেন না। আমার বাবার নেই মুদির দোকান, হোজরীও নেই। আমার বাবা গরীব, স্যার! অধ্যাপক বললেন- আমি এমন কিছু চাইছি তোমার কাছে- যা তোমার আছে। তুমি তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে দাও আমাকে। একটা সুপারি কাটার জাতি দিয়ে কচ করে কেটে দাও।

একলব্য শান্ত হয়ে রইলো।

আন্দাজ করা যায় এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে মনে করে প্রস্তুত হয়েছিল। স্যার, বুড়ো আঙুল আমি কেটে দিচ্ছি হাসতে হাসতে। কিন্তু ওটা আপনার কোন কাজে লাগবে? অধ্যাপক বললেন- সেটা আমিই জানি। আমাকে একটা মহান পরম্পরা রক্ষা করে চলতে হয়। অর্জুনদাসের ভক্তিতে আমি মুগ্ধ। আমি তাকে বরদান করে রেখেছি যে সে-ই পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে। তবে সে তো ফার্স্ট নাও হতে পারে যতক্ষণ তুমি কলম ধরতে সক্ষম থাকবে। তুমি যদি তোমার হাতে আর না লিখতে পারো তাহলেই আমার গুরুবচন রক্ষা হতে পারে। তাই তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আমার চাই।

একলব্য হাসতে লাগলো। কিন্তু স্যার, আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দিলেও আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা। যখন থেকে আমার হুঁস হয়েছে এবং আমার নিজের প্রতি খেয়াল করতে শিখেছি, তখন থেকেই আমি দু-হাতে লেখার অভ্যাস করেছি। কেবলমাত্র দু-হাতের দুটো বুড়ো আঙুল কাটলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটার পরম্পরা তো আপনি গড়ে তোলেন নি, স্যার! অধ্যাপক হতাশ হলেন। বললেন- ওরে অধম! তুই গুরুদ্রোহ করেছিস দুই হাতে লেখার অভ্যাস করে! ঠিক আছে, আমার কাছে অন্য রাস্তা খোলা আছে। সেই সন্ধ্যায় অধ্যাপক অর্জুনদাসকে বললেন– ওর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমি নিতে পারিনি। তবে আমার কাছে একটা দারুণ সুযোগ এসেছে। সেটা থেকে ও বাঁচতে পারবে না। তোমার একটা পেপার এগজামিনের জন্য আমার পরমবন্ধু দেবদত্ত শর্মার সঙ্গে আমি দেখা করতে বেরিয়েছি। তুমি ওর পেপারে ১০০ মার্কের মধ্যে ৯৯ পেয়ে যাবে। এভাবে তুমি একলব্যের থেকে মার্কসে এগিয়ে থাকবে। ওর দুটো আঙুলই কাটা পড়বে।

ব্যাস! অত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মেধা পরিশ্রম সব ওর ঘরে তোলা থাকবে।

অর্জুন নিশ্চিন্ত হল। অধ্যাপকের প্রতি ওর আস্থা অটুট রয়ে গেলো। উনি ডিপার্টমেন্টে এতই প্রভাবশালী ছিলেন যে ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। একলব্যের মনে রেজাল্ট সম্পর্কে আশঙ্কা তবু রয়ে গেছে। কিন্তু অর্জুনদাস নিঃশঙ্ক। তার ওপর গুরুদেবের কৃপা আছে। সমস্ত পরীক্ষা শেষ হবার পর অর্জুনদাস এসেছে অধ্যাপকের কাছে। অধ্যাপক এদিকে মুখ ভার করে বসে আছেন। তাই দেখে অর্জুনের সমস্ত উৎসাহ ঠান্ডা হয়ে গেলো। সে শুধু অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অধ্যাপক ঠান্ডা শ্বাস নিয়ে বললেন-আমি একজন অধম! আমি গুরু হয়ে বচন রাখতে পারলাম না। ভবিষ্যতে আর কোনো শিষ্য গুরুদেবের সেবা করবে না। আগামি দিনগুলোতে অধ্যাপকরা আমাকে ধিক্কার দেবে। কী হলো কি স্যার? অধ্যাপক বললেন ধোঁকা খেয়েছি। পরীক্ষার পেপার এগজামিনের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়নি, দেব দত্তও পায়নি। ভাইস চ্যান্সেলার নিজের হাতে পেপার এগজামিনের ভার দিয়েছেন কোনো এক অজানা অধ্যাপকের হাতে। অর্জুনদাস জিজ্ঞেস করলো- এমনটা হলো কী করে? অধ্যাপক মলিন কণ্ঠে জানালেন-একলব্য আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে দিয়েছিলো। অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই দীর্ঘক্ষণ মাথা নিচু করে নীরব হয়ে বসে রইল।

অর্জুনদাস সহসা বলে উঠল-স্যার, প্রাচীণ কালেও এক একলব্য ছিলো, তাই না!- অধ্যাপক জবাব দিলেন-হ্যা, তবে তারসঙ্গে একালের একলব্যের পার্থক্য আছে যে! সেটা ছিলো পুণ্যযুগ, আর এটা পাপযুগ। পুণ্যযুগের একলব্য তর্কে না গিয়ে গুরুদেবকে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দিয়েছিলো। পাপযুগের একলব্য গুরুকে বুড়ো আঙুল দেখাল।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও বিদ্যাসাগর

গৌতম রায়চৌধুরী

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সমাজ মাধ্যমে বিশাল হৈ চৈ। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদ। সন্ধ্যায় চ্যানেলে চ্যানেলে সেলিব্রেটিদের আলোচনা। আশেপাশের পুরুষদের মধ্যে ফিসফাস– আরে রোজই তো নারী দিবস, আলাদা করে ৮ মার্চ পালনের কী সার্থকতা। ইঙ্গিতটা স্পষ্টতই অর্ধাঙ্গিনীদের প্রতি আচমকা কণ্যাসমা, ছেলের সহপাঠিনীর মৃত্যু-সংবাদ রসিকতার এই হালকা পরিবেশটা বদলে ছিল। মেয়েটি ছিল উচ্চশিক্ষিতা, স্টেটব্যাঙ্কে কর্মরতা এবং একটি দু'বছরের শিশুর মা। মাস তিনেক আগে জন্ডিস ধরা পড়ার পর বন্ধুরা অনেক বলা সত্ত্বেও চিকিৎসায় গুরুত্ব দেয়নি। উপরন্তু শ্বশুর বাড়ির এক বিবাহ অনুষ্ঠানে বাড়ির বউদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, নানান অনিয়মে রোগটা আরও জটিল হয়ে উঠল। স্বামী-পরিজনদের সামনেই চিকিৎসা অবহেলিত হল। বন্ধুদের অনুযোগে উত্তর দিত, 'লোকে কি বলবে!' অবশেষে বিবাহ-সমাপন্তে জন্ডিস পরিণত হল 'হেপাটাইটিস-বি'-তে। কিডনি প্রতিস্থাপনের আগেই শিশুটি মাতৃহারা হল। ঘটনাটি উচ্চশিক্ষা, ভালো চাকরি সত্ত্বেও আজকের সমাজে মেয়েদের প্রকৃত অবস্থানটা দেখিয়ে দিয়ে গেল। এটা তো বিন্দুতে সিন্ধু মাত্র। গ্রামে-গ্রামান্তরে, দেশের আনাচে-কানাচে এই রকম হাজার হাজার

মেয়েরা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এখনও কণ্যার জন্মমুহূর্তে কান্নার রোল ওঠে, নারীকে স্বীয় পরিবারে-শিক্ষাঙ্গণে-কর্মস্থলে পৃথক লড়াই করতে হয়। তাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রয়োজনীয়তা ছিল, আছে এবং সমাজ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত থাকবে।

এই বৈষম্য দুশো বছর আগে তো ছিলই, আরো বেশী করে ছিল। তখন কিন্তু 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতিটুকুও ছিল না। আসলে তখন এটাকে সমস্যা বলে স্বীকারই করা হত না। উনিশ শতকে বিদ্যাসাগর নারীদের এই কষ্ট অনুভব করলেন। এর প্রথম প্রকাশ দেখি ১৮৬৬ সালে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়। তখন তিনি বিট্রিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেই খান্ত হননি। স্বয়ং বীরসিংহ গ্রামে জুলাই মাসে অন্নসত্র স্থাপন করেন এবং দীর্ঘ পাঁচ মাস অন্ন দান করে অসংখ্য লোককে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। দশ-বারোটি গ্রামের দ্বিশতাধিক লোক প্রতিদিন অন্ন গ্রহণ করত। উপরন্তু স্নানের জন্য তেলের ব্যবস্থা করেছিলেন। পাছে অযত্ন হয়, তাই স্বহস্তে মেয়েদের তেল মাখিয়ে দিতেন। গর্ভবতী মহিলাদের সাধভক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রসবের পর নবজাতকের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতেন। অন্ন ছাড়া শাড়িও বিতরণ করতেন, এমনকি যারা অন্নসত্রে আসতে লজ্জা পেতেন গোপনে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন। নারীত্বের মর্যাদা বিদ্যাসাগরই প্রথম দিয়েছিলেন।

হিন্দু বিধবার চরিত্র স্বামীর মৃত্যুর পর কলঙ্কিত হলে শাস্ত্রমতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন কিনা– এই বিষয়ে ১৮৭৩ সালে কোলকাতা হাইকোর্টে এক বিচিত্র মামলা দায়ের হয়। এই বিষয়ে আদালতের পক্ষ থেকে আরও দুজনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতামত আহ্বান করা হয়। অপর দুই পণ্ডিত বলেন, 'হিন্দু শাস্ত্রমতে কলঙ্কিত বিধবা বিষয়চ্যুত হইতে পারে।' কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেছিলেন– 'আমি কিন্তু ভ্রষ্টাচারের পক্ষপাতী নই, কিন্তু একজন বিষয়ের অধিকারিণী হইলে, কেমন করিয়া বলিব, আবার সে বিষয়চ্যুত হইবে।' দশজন বিচারকের মধ্যে আটজনই বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন করেন। তৎকালে বিদ্যাসাগরের প্রভূত সমালোচনা হলেও, আজ প্রমাণিত হয় বিদ্যাসাগর শুধু সঠিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন নারীর সমনাধিকার বিষয়ে নিবেদিত প্রাণ।

নারী মুক্তির জন্য নারী শিক্ষা প্রচলন তাঁর আর এক মহান কীর্তি। ১৯ শতকে বিদ্যাসারই প্রথম যুক্তিনিষ্ঠ নারীশিক্ষা প্রবর্তন করেন। ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর (চন্দ্রমুখী বসু), চিকিৎসক (কাদম্বিনী গাঙ্গুলি) ও প্রথম সেনেটার (সরলা রায়) সবাই তাঁর ছাত্রী।

১৮৫৬-এর ২৬ জুলাই দিনটি ভারতীয় নারী জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়েছিল। ওই বছরেরই ৭ ডিসেম্বর ৬নং সুখিয়া স্ট্রীটে তিনি প্রথম বিধবা বিবাহ দিলেন। তৎকালে তাঁর বিরোধিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে সামাজিক ভাবে একঘরে হতে হয়েছিল, শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল, এমনকি তাঁর প্রাণনাশের জন্য আজকের ভাষায় সুপারি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নারীত্বের প্রতি সম্মান রক্ষা থেকে তিনি পিছিয়ে আসেননি।

যাবতীয় সার্থকতার বিপ্রতীপে, বিদ্যাসাগরের একটি ব্যর্থ প্রয়াস নারীর অধিকার রক্ষা এবং পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারের হাত থেকে নারীকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কৌলীণ্য প্রথার অভিশাপ, পলিগমির বিরুদ্ধতা করে বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ প্রথা রদ করতে চেয়ে ১৮৭১ এবং ১৮৭২ সালে বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব-এর যথাক্রমে ১ম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। যদিও কোনো আইন প্রবর্তিত হয়নি, কিন্তু তিনি গেবষণার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। মোট ১৩৩ জনের নাম-ঠিকানা উল্লেখ করেছিলেন, যারা

সর্বাধিক ৫০ থেকে নূন্যতম ৫ টি বিবাহ করেছিলেন। বহুবিবাহ রদ করার কারণগুলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন। সেদিন না হলেও, স্বাধীন ভারতে আইন পাস হয়েছে। অর্থ্যাৎ তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি।

শেষ করব, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহে প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা...' দ্বিতীয় পুস্তকের (জানুয়ারি, ১৮৫৫) উপসংহারের শেষ দুটি পংক্তি দিয়ে—

'যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিতবোধ নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে। ভারতবর্ষে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না।'

১) বিদ্যাসাগর, বিহারীলাল সরকার। ১৯৮৬। পৃঃ ৩৩২

২) বিদ্যাসাগর, রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড, পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। ১৯৭৪। পৃঃ ১৫৫

মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতর পর]

১৯৫২ সালের একুশে ফ্রেব্রুয়ারি দিনটি মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের মানুষের অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার বিষয়ে প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন কানাডাপ্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন 'মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠী'। বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। তখন ১৫ মার্চ ২০০১ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কোফি এ আন্নান সেই ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা আন্দোলনের তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা এবং ইউনেস্কোর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে এ-সংক্রান্ত তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়া। ২০১০ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) ভবনের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ও এতে ১৮৮টি দেশ সমর্থন জানালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই মাতৃভাষা দিবসটি জাতিসংঘের সকল সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।

এই দিনে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি গানটির করুণ সুর বাজতে থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষিত হয়। এদিন শহীদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে রেডিও, টেলিভিশন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেশের সংবাদপত্রগুলিও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। বাংলা একাডেমি ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ঢাকায় একুশে বইমেলার আয়োজন করে।

সুতরাং এটা আমরা বলতেই পারি ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে এক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে আর ভাষার সাথে সাথে দেশ ও দেশের মানুষও পেয়েছে প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধা।

বেথুন ইন্সটিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিবেদক : স্নেহাংশু চাকদার

বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ২২ ফেব্রুয়ারি, শনিবার পালন করি। এলাকার দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোপকরণ বিতরণের দ্বারা সামান্য সাহায্য করার চেষ্টা আমরা করছি। প্রয়াত সহ-সভাপতি রামরমণ ভট্টাচার্যের দেওয়া তহবিল, তা ছাড়া রামমোহন মিশন, প্রাক্তন সম্পাদক দীপেশ মিত্রের পরিবারবৃন্দ, লিজার্ড স্কীন, মেসার্স ফিউসন স্টেপস্-সহ আরো অনেকেই আমাদের আর্থিক সাহায্য করেছেন। আমরা একশত পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে স্কুল ব্যাগ, জলের বোতল, খাতা, পেন-পেন্সিল, ইরেজার-সহ পেনসিল বক্স তুলে দিয়েছি। তাছাড়া তাদের জন্য সামান্য টিফিনের ব্যবস্থাও করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরদাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, দাসনগর বিদ্যামন্দির, বাণীসদন প্রাথমিক বিদ্যালয়, সত্যরঞ্জন খাস্তগীর শিশু ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা-সহ যথাক্রমে ৩৬, ২২, ৩০ ও ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী। তাছাড়া উপস্থিত ছিল যোধপুর পার্ক বয়েস স্কুল, কাটজুনগর বিদ্যাপিঠ, যোধপুর পার্ক গার্লস হাইস্কুল, রামমোহন মিশন স্কুল, সেন্ট সেবাসটিয়ান স্কুল, যাদবপুর হাই স্কুল, কার্মেল স্কুল, নামখানা ইউনিয়ন হাই স্কুল, বিক্রমগড় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ন্যাশানাল প্রি-প্রাইমারী স্কুলের যথাক্রমে ০৭, ০৩, ০৩, ০৩, ০২, ০১, ০১, ০১ ও ২ এবং ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্য সামগ্রী তুলে দেন ভাষা আন্দোলনের সৈনিক কাজল সেন, রামমোহন মিশন হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল সুজয় বিশ্বাস, লেখক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট কবি অমল কর, সংস্থার সহ-সভাপতি অশোকরঞ্জন ধর, পরিচালন পরিষদের সদস্য রমাপ্রসন্ন দত্ত ও প্রয়াত সম্পাদক দীপেশ মিত্রের স্ত্রী নমিতা মিত্র।

বরদাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী দে সরকার, সত্যরঞ্জন খাস্তগীর শিশু ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মণিষা ভট্টাচার্য, দাসনগর বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক দেবজয় লামা, বাণীসদন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পারমিতা সাহা- আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে পাঠ্য সামগ্রী তাদের স্কুলের দুঃস্থ শিশুদের প্রদান

করা হয়েছে তাতে তাদের প্রভূত উপকার করবে।

ডা. বীরেন মজুমদার, রথীন্দ্রনাথ মৈত্র ও শিপ্রা মজুমদার-এর যৌথ সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়।

পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখা করেন সংস্থার সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরী। তাছাড়া মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য, বর্তমান পরিস্থিতি ও বেথুনের কার্যাবলীর প্রশংসা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ভাষা সৈনিক কাজল সেন, রামমোহন মিশন হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল সুজয় বিশ্বাস, লেখক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি অমল কর। গত ৩১ জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত বনভোজনে মিউজিক্যাল চেয়ার ও বল থ্রো এর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মিউজিক্যাল চেয়ারে শুভা ব্যানাজী, কল্পনা ব্যানার্জী, গোপা দাশগুপ্ত এবং বল থ্রো-তে লক্ষী কর, নারায়ণ ঘোষ ও সৌমেন মন্ডল– এই ৬ জন বিজয়ীর হাতে সামান্য পুরস্কার তুলে দেন স্নেহাংশু চাকদার।

পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে ডাঃ কৃষ্ণা হালদার, সীমা চ্যাটার্জী। সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন অঞ্জলী অধিকারী, সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্যামলী ঘোষ এবং পরবর্তীতে শুক্লা ঘোষ-এর আবৃত্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সোমাশ্রী হালদার।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - বুধবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam RoyChowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045. Editor - Goutam RoyChowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in